Vol. 31 | No. 2 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবন-জিজ্ঞাসায় বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ

Volume	31
Issue	2
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লতিফা বেগম
Published online	February 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i2.4
Pages	141-156
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জীবন-জিজ্ঞাসায় বেগম শামসুন্

Check for updates

লতিফা বেগম

মানুষের জীবনকে ঘিরে আছে তার বিরাট জীবন জিজ্ঞাসা, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন দিকের জিজ্ঞাসা। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানা বিষয়, নানা কৌতূহল প্রশ্নার্ত ও অতৃপ্ত মানুষকে নিয়ে পাড়ি দিতে চায় এক অজানা দিগন্তে, সত্যের সন্ধানে। কেউ বা কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে, আবার কেউবা পারে না।

বাংলার মুসলিম নারী আন্দোলন, তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের বৃহত্তর নারী জাগরণের অন্যতম পথ প্রদর্শক ও মুক্তি দিশারী, বেগম শামসুননাহার মাহমুদের (১৯০৮-১৯৬৪) জীবনে এই জিজ্ঞাসা ছিল যে দুস্থনারীর, অবরুদ্ধ নারীর মুক্তি কোথায়? কোন পথে আসবে মুসলিম নারী সমাজের অধিকার, গড়ে উঠবে এক সুখী-সমৃদ্ধশালী মানবসমাজ?

দুই যুগ পূর্বে প্রয়াত এই বিদুষী নারী, বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদের 'জীবন-জিজ্ঞাসা' ও 'জীবন-দর্শন' আলোচনা করে তাঁর অমর কীর্তি ও অবদান সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হতে হলে, এ দেশীয় সমাজে, তখনকার দিনে, নারীর স্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

এ উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর অতীত থেকে নারী জীবন নানাভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেশিত হয়ে আসছে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এ দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে পুরুষের হাতের ক্রীড়নকরূপে নারীদের স্বকীয় কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুদূর অতীতে নারীদের মধ্যে মনীষার বিশেষ স্ফুরণ ঘটলেও এবং খনা, আত্রেয়ী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী প্রমুখ বিদুষী নারী সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব অবদান রেখে গেলেও, সমাজ-

বিবর্তনের ধারায় তাদের বিশেষ কোন প্রতিপত্তি ছিল না। পিতৃ-প্রধান সমাজে বহু বিবাহ একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায় এবং 'পতির ধর্মে সতীর ধর্ম' নারী জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দেখা দেয়। এজন্য স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নারীকে বাধ্য হয়েই চিতায় আরোহণ করে সতীত্বের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হতো।

মুসলিমেরা সিন্ধুদেশ জয় করার পর থেকে ইসলামের ধারণাসমূহ এদেশে প্রবেশ করলেও নারী সমাজ যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেল। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা পুরুষের উর্ধ্বে থাকলেও সামাজিক ব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। পাঠান এবং মোঘল শাসকগণ সদ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ইসলামের মূল নীতিগুলো সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। এজন্য তারা এদেশীয় রাজন্যবর্গের অনুসরণ করে নারীকে অন্তঃপুরে ভোগের পাত্রী হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। অন্তঃপুরে কাব্য-সাহিত্যে মোঘল সম্রাট বাবরের কন্যা বেগম গুল্‌বদন্, সম্রাট শাহ-জাহানের কন্যা জাহান্-আরা, সম্রাট আওরংজীবের কন্যা জেব্‌উন্নিসা এবং অপরদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানা[১] প্রমুখ নারীগণ যদিও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাসত্ত্বেও তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পথে কোন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। যদিও হিন্দু সমাজের মত সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়নি, তবুও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুসলিম নারীরা ছিল নানাভাবে অবহেলিত।

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তন হওয়ার পরেও নারী সমাজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি। ইংরেজ শাসনের সূচনাতে ভারতীয় মুসলিম সমাজ তথা বাংলাদেশীয় মুসলিম সমাজ ইংরেজ শাসনের স্পর্শ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সতর্ক হওয়ায় মুসলিম সমাজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত রইলো। এরপর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর রাজা রামমোহন রায়, নারী মুক্তি কল্পে সতীদাহ প্রথা রহিত করার জন্য এক আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং ভারতীয় গভর্ণর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক[২] সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। পরবর্তী সমাজ নেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[৩], একদিকে যেমন বহু-বিবাহ প্রথা লোপের জন্য আজীবন চেষ্টা করেন,

তেমনি অপরদিকে বিধবা বিবাহ প্রচলের জন্য তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবনকালেই বহুবিবাহ প্রথা লোপ পায়, কিন্তু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে গোড়া সমাজের লোকদের ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[৪] এ-প্রতিক্রিয়া তাঁর রচিত 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) নামক উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন, ডেভিড হেয়ার[৫] এবং অন্যান্য নারী হিতাকাঙ্ক্ষী মহামানবগণ। তার ফলে এদেশীয় নারী জীবনে পুনর্জাগরণের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠে। ঠাকুর পরিবার ব্যতীত, তৎকালীন হিন্দুসমাজের যেসব লোকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যেও নারী জাগরণ ও নারী প্রগতির নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁর কাব্য জীবনের সূচনায় ইংরেজীতে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তারই বাস্তব প্রকাশ 'The Captive Ladie'।[৬]

সমসাময়িককালে তাঁরই মত খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত দু'জন মহীয়সী মহিলা তরু দত্ত ও অরু দত্ত[৭] ইংরেজীতে কাব্য রচনায় অগ্রসর হন। এভাবে হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভূত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবে এবং হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণের বিদ্রোহের ফলে, নারী জীবন সত্যিকার মানুষের জীবনের সমপর্যায়ে স্বীকৃতিলাভ করে। এ বিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসেবে এদেশের সর্বত্র নারী জাগরণের সুর ধ্বনিত হয়।

মুসলিম সমাজে এ জাগরণের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল পরে দেখা দেয়। মুসলিম সমাজে পূর্বাপর পর্দাপ্রথার অত্যন্ত কড়াকড়ি থাকায়, মুসলিম নারী সমাজে পর্দাপ্রথার অন্তরালে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর চর্চা ছিল বটে, তবে ঢালাও করে মুসলিম নারী সমাজে কোন জ্ঞানের চর্চা ছিল না, বিশেষ করে বাংলাভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ছিল তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পর্দার অন্তরালে অবস্থান করেও যে কয়েকজন বিদুষী মুসলিম মহিলা জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করে তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কার, অবরোধ, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য যে আপোষহীন সংগ্রাম

করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মরহুমা বেগম রোকেয়ার নাম মুসলিম ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। মুসলিম জন-সাধারণের ভাষা যে বাংলা এবং একমাত্র বাংলার মাধ্যমেই যে তাদের জীবনে শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারে—এ ব্রত নিয়েই বেগম রোকেয়া রক্ষণ-শীল পারিবারিক ঐতিহ্য, সমাজের ভ্রূকুটি ও শাসন উপেক্ষা করে বাংলাভাষায় শিক্ষালাভের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার আলো, জাগরণের আলো, মনুষ্যত্বের আলো বিস্তারের জন্য কলকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বাঙ্গালা বা নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম রোকেয়া আজীবন যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করে নারী জীবনের ভবিষ্যতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, তারই সাক্ষাৎ উত্তরসূরী হিসেবে দেখা দেন বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদ। বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনু-প্রাণিত হয়ে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ শিক্ষাদানকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে সমাজ সংস্কার ও সমাজ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পর্দার নামে নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা তাঁর মনে তীব্র বেদনাবোধের সঞ্চার করে এবং নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তাঁর মনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তোলে। এ সময় তাঁর জীবনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তা বাস্তবিক পক্ষে বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে বেগম শামসুন নাহার মাহ্‌মুদকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তা তাঁর জীবনী আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারবো।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে নোয়াখালী জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেগম শামসুন নাহারের জন্ম, কিন্তু তাঁর শৈশব ও কৈশোর-জীবন অতিবাহিত হয় চট্টগ্রাম জেলায়, খান বাহাদুর আবদুল আজিজ (মাতামহ) সাহেবের বাসভবনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গ্রাজুয়েট খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে বাংলার মুসলিম সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন উদারমনা শিক্ষাবিদ, সাহিত্য-রসিক, সমাজ সংস্কারক ও ও স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগী। তাঁর তামাকুত্তিস্থিত বাড়ীকে (চট্টগ্রামে) সর্ব

সাধারণ "বি. এ. সাহেবের বাড়ী" বলে পরিচয় দান করতো। কথিত আছে যে, অতি অল্প বয়সে শামসুন্ নাহারের পিতার মৃত্যু হলে, খান বাহাদুর সাহেব তাঁর কন্যার সন্তানদ্বয়—তিন বছরের শিশুপুত্র হাবিবুল্লাহ বাহার ও ছয়মাসের শিশুকন্যা, বেগম শামসুন নাহারকে নিজের বাড়ীতে এনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, নিজের স্নেহছায়ায় ও ভাবাদর্শে তাঁদের প্রতিপালন করেন। অপরদিকে বেগম শামসুন্ নাহারের প্রপিতামহ মুনশী তমিজউদ্দিন আহমদ সেকালের সরকারী উকিল ছিলেন এবং পিতামহ মৌলভী ফজলুল করিম বি. এ., বি. এল. (তমিজউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র) বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম গ্রাজুয়েটদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মুনশী তমিজউদ্দীনের পাঁচপুত্র সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত ও গ্রাজুয়েট ছিলেন, যা তখনকার দিনে একই পরিবারে, বিশেষকরে মুসলিম পরিবারে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কথিত আছে যে, বৃটিশ সরকার মুনশী তমিজ-উদ্দীন সাহেবের স্ত্রীকে এইজন্য "রত্নগর্ভা" উপাধি ও একটি স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। শামসুন্ নাহারের পিতা মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্ চৌধুরীও শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার আগেই মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। শামসুন্ নাহারের মাতা আসিয়া খাতুন চৌধুরানীও তাঁর চারবোন সকলেই সেকালের তুলনায় বেশ ভাল-লেখাপড়া জানতেন। তাঁদের চিন্তাধারাও ছিল আধুনিক ও উন্নত। শামসুন্ নাহারের বড়ভাই হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীও এদেশের এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ, ও সমাজসংস্কারক—যাঁর সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা শামসুন নাহারের জীবনের প্রতি-পদক্ষেপে চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে (আষাঢ় ১৩৬৫) ভাই-এর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর লেখা বইটি "নজরুলকে যেমন দেখেছি" উৎসর্গ করে লিখেছেন:

> যাকে দিয়ে নজরুলের সংগে পরিচয়, আমার জীবনের পথপ্রদর্শক, আবাল্য-সহচর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
> বাহারকে দিলাম"।[৮]

এজন্য পিতৃকুল ও মাতৃকুল, উভয় কুলেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার সম্পূর্ণ প্রভাব বেগম শামসুন নাহারের

জীবনে ভীষণভাবে রেখাপাত করেছিল। কিন্তু উভয় পরিবারই জ্ঞানানুরাগী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সত্ত্বেও ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। এজন্য অন্তঃপুরের নারীরা ঘরের বাইরে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বেগম শামসুন্ নাহার মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বাইরের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু নয় বছর বয়স হলে তাঁকে আর স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে শামসুন নাহারের পরিবারে পড়াশুনার সুযোগ স্বরূপ ছিল এক মস্তবড় লাইব্রেরী এবং একটা সুন্দর সাহিত্যিক পরিবেশ। উক্ত লাইব্রেরীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লেখকদের রচিত বই সযত্নে রক্ষিত ছিল, যেমন 'বিষাদ-সিন্ধু', 'মহাশ্মাশন কাব্য', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'অশ্রুমালা', 'আনোয়ারা', ইত্যাদি। তাছাড়া কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নবনূর', 'ইসলাম প্রচারক', 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা,' 'মোসলেম ভারত', 'সওগাত', 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকা তিনি (শামসুন্ নাহার) নিয়মিত পড়তেন। অপরদিকে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সাধনা' ও 'অন্বেষা' নামক যে দুটো পত্রিকা প্রকাশিত হত (যেখানে মা ও খালাস্মাদের লেখা থাকতো) সেগুলোও খুব আগ্রহের সাথে পড়তেন। ১৯২০ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদনায় 'আঙুর' নামে কিশোরদের যে পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়, তাতে শামসুন্ নাহারের প্রথম লেখা একটি কবিতা "প্রগতি" প্রকাশিত হয়। এরপর 'নওরোজ' ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়; ফলে সাহিত্য মহলে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও রক্ষণশীল আত্মীয়-স্বজনরা তা সুনজরে দেখেননি। কিছুদিন পর বড়ভাই হাবিবুল্লাহ্ বাহারের উৎসাহ ও চেষ্টায় "পুন্যময়ী" (ইং ১৯২৫) নামক তাঁর একখানি গ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছিলেন: "লেখিকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'আঙ্গুর'কে লইয়া। তারপর তিনি 'পুণ্যময়ী' লইয়া আসিয়াছেন। ...লেখিকার হাতে নারী চরিত্র ফুটিয়াছে ভাল। ...এই নাটক নভেলের যুগে গ্রন্থকর্ত্রী যে প্রহত পন্থা ত্যাগ করিয়া পুন্য সৌরভময় নারীজীবন চয়ন করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য অনেক আশার সঞ্চার হয়"।[৯] শামসুন্ নাহারের সাহিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন নারী শিক্ষার উদ্‌গাতা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন: "তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া আজ অনেকদিন আগের

একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রি বেলায় আমরা বিহারের এক নদীপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলাম। বাইরের অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—শুধু নদীতীরের অন্ধকার বনভূমি হইতে কেয়া ফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কখনো দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি"।[১০]

অপরদিকে বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এ-দুই শিক্ষাভিলাষী, হাবিবুল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন নাহারের কাছ থেকে। যে সৃষ্টি প্রতিভা কবিকে উদ্দীপ্ত করেছিল, তা তিনি নিঃসংকোচে ব্যক্ত করেছেন বেগম নাহারকে লেখা একখানি চিঠিতে: "ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে, সেখানে আমায় গান গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু, সেটুকু আমার, আর কারুর নয়"।[১১] পত্রের আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "কারুর বলা যদি আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে। তোমরা আমায় বলেছ লিখতে। সে-বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে, শিশিরে ছোঁওয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসত না"।[১২] এ ছাড়াও কবি শামসুন্ নাহারের বাল্য রচনা 'পুন্যময়ী' সম্বন্ধে উপহার স্বরূপ একটি আশীর্বাণীও লিখে পাঠিয়েছিলেন:

> অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্যরূপ,
> তুমি আছো—আছে তোমারো দেবার, তব গেহ নহে অনুরূপ!
> আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
> অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল কুসুম![১৩]

এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে কবি নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম সফরের স্মৃতি স্বরূপ, তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সিন্ধু-হিন্দোল'-এ দুই কৃতি ভাইবোন বাহার ও নাহারের নামে উৎসর্গ করে লিখেছেন:

কে তোমাদের ভালো!
'বাহার' আন গুলশানে গুল্, 'নাহার' আন আলো।

'বাহার' এলে মাটীর রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
'নাহার' এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

তোমরা দু'টি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটি বোঁটায় ফুট্‌লি এসে,—নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল বোল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি![১৪]

[তামাকমন্তি, চট্টগ্রাম ৩১-৭-২৬]

আলোচ্য কবিতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় কবি নজরুল ইসলাম বাহার ও নাহারকে কতখানি দরদ দিয়ে ভালবেসেছেন। অপরদিকে, শৈশবকালে বাহার ও নাহার উভয়ই কবির বিভিন্ন লেখা কবিতা, অপূর্ব জাগরণী গান, উপদেশ ও পত্রালাপের মাধ্যমে আনন্দে সম্মোহিত হয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কবির আশীর্বাণী শামসুন্ নাহারকে শুধু ধন্য করেনি, উদ্বুদ্ধ করে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে এগিয়ে যেতে, নূতন নূতন সাহিত্য সৃষ্টির কাজে। যেমন নাহারকে লেখা কবির একটি পত্রে ছিল: "আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বার হাত লম্বা আর আট হাত চওড়া দেয়াল। বাহিরের আঘাত ঐ দেয়ালে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙ্গন নেই, অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিণী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে "আমরা বন্দিনী"। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগ দেবতা।"[১৫] একবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক অনুষ্ঠানে ছাত্রীরদের উদ্দেশ্য করে বেগম শামসুন্ নাহার বলেছিলেন: "তোমরা জন্মেছ উজ্জ্বল আলোকের প্লাবনের মধ্যে, আর আমাদের জন্ম গভীর অন্ধকারে; অন্ধকারেই হয়েছে আমাদের যাত্রা শুরু। অন্ধকারকে ভেদ করে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি আমরা আলোকের তীরে। আলো তোমাদের কাছে এসেছে সহজ স্বাভাবিকভাবে। আর আমরা আলো জয় করে এনেছি। আলো হয়তো সেই জন্য আমাদের কাছে বেশী মূল্যবান। এইটুকু তফাৎ রয়েছে

তোমাদের আর আমাদের যুগে। সে যুগের সেই আলোর অভিযানে যিনি আমাদের অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের কবিদা।"[১৬]

১৯২৬ সালে বেগম শামসুন্ নাহার কঠোর পর্দার অন্তরালে থেকে স্বকীয় সাহস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়-চিত্ততার ফলে প্রাইভেটে প্রবেশিকা পরীক্ষায় চারটি লেটারসহ ৭৫% এর বেশী নম্বর ও তারকাচিহ্ন নিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। এরপর উপায়ন্তর না দেখে, উচ্চ-শিক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে অভিভাবকরা তাঁর বিয়ে দেন ডাক্তার ওয়াহিদ-উদ্দীন মাহমুদের সাথে। উল্লেখ্য যে, শামসুন নাহারের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাঁর বিয়ের পর। কারণ তাঁর স্বামী ডা. মাহ্মুদ অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী, সজ্জন ও উদারপন্থী পুরুষ ছিলেন, যাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন, সাহায্য, ও সজাগ অনুপ্রেরণা না পেলে এ বিদুষী নারীর জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি এতদূর এসে পৌঁছাতো কিনা সন্দেহ। পরবর্তীতে স্বামীর সহযোগিতায় কলকাতা 'ডায়োসিসান' কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯২৮ সালে আই. এ. এবং ১৯৩২ সালে প্রাইভেটে ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পাস করেন। এরপর দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৪২ সালে কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাস করেন। উল্লেখ্য যে, আজীবন শিক্ষাব্রতী, সাহিত্য-সাধক ও অক্লান্ত সমাজকর্মী এই দেশবরেণ্য মহিলা একাধারে একটি কলমুখর সুখী-পরিবারের কর্ত্রী ও জননী এবং বাইরের জগতে এক অনন্যা সমাজকর্মী হিসেবে একান্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৩২ সালে মুসলিম নারী শিক্ষার পথিকৃৎ, বেগম রোকেয়ার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলার মুসলিম নারী সমাজকে অবরোধের অন্তরাল থেকে পরবর্তীক্ষেত্রে প্রগতিশীল জীবন বিকাশের দিকে এগিয়ে নেবার মহান ব্রত সামনে নিয়ে বেগম মাহ্মুদকে অগ্র-গামীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। বেগম রোকেয়ার জীবনালেখ্য "রোকেয়া জীবনী" শেষ করে বেগম মাহ্মুদ এক বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ বই-এর ভূমিকায়, যাঁকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন এবং যাঁর সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন, বলেছেন: "প্রথম যখন রোকেয়া-জীবনী লিখিবার কল্পনা করি তখন রোকেয়া জীবিত ছিলেন। এই মহিমময়ী নারীর সংগে কয়েক বৎসর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। অবসর সময়ে গল্প করিতে করিতে তিনি আপনার জীবনের নানা বিচিত্র ছবি আমার চোখের সামনে তুলিয়া

ধরিতেন। এভাবে তাঁহার অদ্ভুত জীবনের ও ততোধিক অদ্ভুত চরিত্রের এমন নিগূঢ় তথ্যের সংগে আমার পরিচয় ঘটিয়াছে, যাহা জানা অন্য কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে।"[১৭] এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার বলেন: "এই জীবনী যিনি লিখেছেন তিনিও সামান্যা নহেন। তিনি যে এমনভাবে এই চরিত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তার কারণ তিনি এই জীবনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন।"[১৮]

স্কুল জীবন থেকেই শামসুন্ নাহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন, 'নওরোজ', 'আত্মশক্তি', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'জয়ন্তী', 'মাহেনও', 'দিলরুবা' প্রভৃতিতে লিখতেন, যা সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর লেখার প্রধান উৎস ছিল নারী সমাজ ও শিশু—যারা দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁর লেখার (যা সহজ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত) প্রতিটি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে সে যুগের অন্যায়-অবিচার, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলে মেয়েদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন করেছেন। এই উদ্দেশ্যে ভাই বাহারের যুগ্ম সম্পাদনায় ইংরেজী ১৯৩৩ সালে 'বুলবুল' নামে একটি উন্নতমানের মাসিক পত্রিকা বের করেন, যা তখনকার দিনে মুসলিম সমাজে বিরল ছিল। এরফলে বাংলার মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়ে নাহারকে লিখেছিলেন: 'বুলবুল' পত্রিকাখানা পড়ে আশান্বিত হলুম। সর্বনাশের উন্মত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভবুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা করো। ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগে গৌরবান্বিত করবে। কৃতজ্ঞ দেশের আশীর্বাদে তোমাদের উদ্যম জয়যুক্ত হোক"।[১৯] বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক অন্নদাশঙ্কর রায়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: "বিদগ্ধ মুসলমানের চিত্ত কোথাও এমন ক'রে স্ফূর্ত হতে দেখিনি। দেশের এই বেদনার্ত ক্ষণে এর আবির্ভাব ইতিহাসে স্থান লাভ করবে।"[২০]

শামসুন্ নাহারের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা যদিও পর্যাপ্ত নয়, তবুও সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান হিসেবে তাঁর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে বাঙালী

মুসলিম সমাজ এক অভিনব অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাঁর লেখা 'আমার দেখা তুরস্ক' বইটি তৎকালীন পাকিস্তান শুভেচ্ছা মিশনের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের ফলশ্রুতি। দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সাথে পরিচয় ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি তা জনহিতকর ও সমাজ গঠনমূলক কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে 'নজরুলকে যেমন দেখেছি'—বাহার, নাহারের অবাল্য সুহৃদ, নজরুলের স্মৃতিকথা ও তাঁদের সাহিত্য রচনার মূল উৎসের স্বাক্ষর বহন করছে। বইটির ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন: "নজরুল প্রতিভার উদয়, প্রকাশ ও পূর্ণ গৌরবের যুগে যাঁরা তাঁর কাছাকাছি আসবার, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসবে এবার। কবির অগণিত ভক্তদের মধ্যে যাঁরা তাঁর এবং তাঁর যুগ সম্পর্কে গবেষণার ভার নিচ্ছেন বা নেবেন, তাঁদের প্রতি পূর্ববর্তীদের কিছুটা দায়িত্ব আছে। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পূর্ণ অভাব দেখা গেছে বলে নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। এঁদের কাজ যাতে সহজতর হয়, তার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যার যতটুকু সাধ্য মালমসলা তৈরী ক'রে দেওয়া আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি এবং এ ধারণা থেকেই এই লেখায় হাত দিয়েছি আমি"।[২১]

শামসুন্ নাহারের অন্যান্য রচনাবলী হচ্ছে 'ফুল বাগিচা', 'বেগম মহল', ইত্যাদি এবং অনুবাদ করেছেন ইরমেন গার্ডে ইবারলী রচিত 'নার্স' বইখানি (সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)।

শুধু সাহিত্যেই নয়, শিশু মনস্তত্ত্বেরও সাধনা করে 'শিশুর শিক্ষা' নামে একটি মূল্যবান ও তথ্যমূলক পুস্তক রচনা করে বাংলার শিশুদের উচ্চ আদর্শ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করে লিখেছিলেন:

"ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সকল রচনাকেই
আমি অন্তরের সংগে প্রশংসা

করে থাকি। কী ভাষায়
কী মননশক্তিতে কী সরসতায়
তোমার লেখা যে বিশিষ্টতা
লাভ করেছে আমি তার
প্রশস্তিবাদ তোমাকে পাঠাই
তোমার গ্রন্থে তার ব্যবহার
করতে পার। ইতি ৭।৪।৩৯
শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[২২]

অধ্যাপনা জীবনেও বেগম শামসুন্ নাহার (লেডী ব্রেবোর্নে, ইডেন গার্লস কলেজ প্রভৃতিতে) অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা বাস্তবায়িত করার পক্ষে অনুপ্রেরণা স্বরূপ নারী-জাতিকে নানা উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করতেন। একবার ১৯৩২ সালে কলকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল থেকে শামসুন্ নাহারকে বি. এ. পাশ উপলক্ষে সম্বর্ধনা দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন: "আমি আশা করি সেদিন দূরে নয়—যেদিন আমাদের সমাজের মেয়েরা শুধু বি. এ. পাশ করে সংবর্ধনা পাবেন না—সংবর্ধনা পেতে হলে তাঁদের আরো বড় কাজ করতে হবে"।[২৩] এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার ভাষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "আজ আমরা নাহারের বি. এ. পাশ উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছি। নাহারের এ গৌরব শুধু তাঁর একার নয়। —এ গৌরব আমাদের সমস্ত নারী সমাজের। অন্যদের সাথে নাহারের বি. এ. পাশের তফাৎ আছে, কারণ সে পাশ করেছে স্বামী, সন্তান ও ঘর সংসার সামলিয়ে, যা একজন নারীর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমি আশা করি সমাজের মেয়েরা নাহারের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে আসবে।"[২৪]

প্রাক-পাকিস্তান যুগে সুদীর্ঘ বিশ বছরব্যাপী বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদ, বাংলা তথা ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনের সাথে এবং ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পরেও পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল অবিচল। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা ব্যাপক-ভাবে সফর করে বহু সেমিনার, সভা ও কনফারেন্সে নিজের দেশের সাথে সৌহার্দ্যের কথা তুলে ধরেন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতা ও ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গঠনমূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সৃজনমুখর

পরিবেশে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশের আপামর জনসাধারণকে। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মহিলা সমিতি, রেডক্রস সোসাইটি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘ, গার্লস গাইড এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। অপরদিকে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ উইমেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্ত্রী-শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটি প্রভৃতি,—অন্যদিকে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি, পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, পাকিস্তন রেডক্রস সোসাইটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিনেট, বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার কমিটি, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য, প্রাদেশিক শিক্ষা উপদেষ্টা কাউন্সিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও কমিটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে মানবজাতির তথা নারীজাতির সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে যে ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়, এ সময় শামসুন্ নাহার এদেশের মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন করেন এবং ১৯৩৬ সালে তিনি বাংলার নারীর তরফ থেকে কোলকাতা কাউন্সিল হাউসে ডেলিমিটেশান কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেন। ফলে এদেশের মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার পায়, এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৪ সালে বৃটিশ সরকার শামসুন্ নাহার মাহ্মুদকে সমাজ সেবা, ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "এম. বি. ই" উপাধি এবং ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার "স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার" (মরণোত্তর) উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।

১৯৬১ সালের ১লা নভেম্বর শামসুন্ নাহারের চলার পথের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও স্বামী এবং ১৯৬৪ সালের ১১ই এপ্রিল মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। কিন্তু আজীবন অবরুদ্ধ নারী সমাজের অবহেলা-অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তামাশা—বিদ্রূপ ইত্যাদি অবসানের জন্য ক্রমাগত কঠোর সংগ্রাম করেছেন, বাংলাদেশের নারী জাগরণের ইতিহাসে তার অবদান অমর পাথেয় হয়ে চিরকাল বিরাজ করবে।

তাঁর মৃত্যুতে দৈনিক পত্রিকা "পূর্বদেশের" সম্পাদকীয়তে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল: "আমাদের সমাজ জীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে বেগম শামসুন্ নাহারের আবির্ভাব ঘটে। আর সে-সন্ধিক্ষণে সে আবির্ভাব ছিল একক আবির্ভাব। তাঁর সেদিনের সমাজে তাঁর সাথী ছিল না, তাঁর সাধনার অনুকূল পরিবেশ ছিল না, বরং ছিল সামাজিক প্রতি-বন্ধকতা। কিন্তু সব বাধা, সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এই মহীয়সী মহিলা নিজের তথা এদেশের নারী সমাজের অগ্রগতির পথ রচনা করেন"।[২৫]

বেগম শামসুন্ নাহার মাহ্মুদ আজ আমদের মধ্যে নেই সত্য, কিন্তু রয়েছে তাঁর অম্লান স্মৃতি, তাঁর স্বপ্ন, তার সাধনা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব আমাদের। শামসুন্ নাহার মাহ্মুদের জীবন-দর্শন সম্পর্কে তাই ব্যাপক গবেষণার অবকাশ ও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ছাত্রী-নিবাস "শামসুন নাহার হল" নামে যে সৌধদ্বয় দাঁড়িয়ে আছে, এর প্রতি ধূলিকণায় রয়েছে পুন্যশ্লোক বেগম শামসুন্ নাহারের নাম। প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যিনি আজীবন নারী শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করে নৈতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, তাঁরই বিজয় বার্তা এ হলের সর্বত্র বিকশিত হচ্ছে। বাস্তবে দেখা যায় যাঁরা মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ ও আপোষহীন সংগ্রাম করেন, জীবনকালে তারা অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করলেও, কালের ধারায় তাঁদর সে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান "শামসুন নাহার হল" সেই বার্তাই বহন করছে। আজ বাংলার নারী সমাজ তথা বাংলার মানব সমাজ সশ্রদ্ধ নয়নে, এ হলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মহান নীতিরই সত্যতা মনে—প্রাণে অনুভব করছে। বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদ তাই এদেশীয় নারী সমাজে কোন ব্যক্তিসত্তা নন, তিনি বাংলার নারী জাগরণ ও নারী প্রগতির এক মূর্তিময়ী অগ্রদূত হয়ে ইতিহাসে অমরত্বলাভ করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, 'শামসুন নাহার মাহ্মুদ' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২২ মাঘ ১৩৯৩)

কাজী আবুল হোসেন, 'ছোটদের শামসুন্ নাহার মাহমুদ' (মুক্ত-ধারা ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮)

Ghulam Murshid, Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849-1905 (Sahitya Samsad, Rajshahi University, Rajshahi, 1983)

ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন', (সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৮৪)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত মধুসূদন কাব্যগ্রন্থাবলী, ঢাকা ১৯৭০।

নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব', সংক্ষেপিত সংস্করণ (লেখক-সমবায় সমিতি, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৫৬)

শামসুন্ নাহার, 'রোকেয়া জীবনী' (বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৩৭)

ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল—চরিতমানস' (দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬৭)

শামসুন্ নাহার মাহমুদ, 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' (নবযুগ প্রকাশনী, কলিকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৬৫)

শামসুন নাহার মাহ্মুদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১ পুন্যময়ী, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯২৫
২ ফুলবাগিচা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা (সন ছিল না)
৩ বেগম মহল, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা (সন ছিল না)
৪ রোকেয়া জীবনী, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৭
৫ শিশুর শিক্ষা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৯
৬ আমার দেখা তুরস্ক, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫৫
৭ নজরুলকে যেমন দেখেছি, নবযুগ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৫৮
৮ 'নার্স', মূল : ইয়মেন গার্ডে ইবারলী
অনুবাদ: বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩২৬), পৃ. ৩, ২১, ৩২, ৩৯-৪০

২ শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ও রামমোহন (৭৩ মাহাত্মা গান্ধী রোড, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা—৯, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৮৪), পৃ. ১০

৩ সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর (৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৮৩), পৃ. ২০

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৮৪ : ১৮৯৯ শক), পৃ. ১০৩-০৪

৫ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৯৭৩) পৃ. ৪২৮-৩০

৬ মধুসূদন কাব্য-গ্রন্থাবলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৭০

৭ *Reluctant Debutante* : Response of Bengali women to Modernization, 1849-1905, (Sahitya Samsad, Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh, 1983), p. 83.

৮ শামসুন্ নাহার মাহ্মুদ, নজরুলকে যেমন দেখেছি (নবযুগ প্রকাশনী, ২৯ বি, নাসিরুদ্দীন রোড, কলিকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৬৫), পৃ. উৎসর্গ পৃষ্ঠা।

৯ 'আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, 'শামসুন নাহার মাহমুদ' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২২ মাঘ ১৩৯৩), পৃ. ৪৫-৪৬

১০ ঐ, পৃ. ১৯

১১ উদ্ধৃত, শামসুন নাহার মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১২ উদ্ধৃত, শামসুন নাহার মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

১৩ কাজী আবুল হোসেন, ছোটদের শামসুন নাহার মাহমুদ (মুক্তধারা, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮) পৃ. ১৯

১৪ নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কেন্দ্রীয় বাঙ্লা-উন্নয়ন বোর্ড, ১০, গ্রীন রোড, ঢাকা. প্রথম প্রকাশ : ৯ পৌষ ১৩৭৪) পৃ. ৯১

১৫ উদ্ধৃত, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮

১৬ উদ্ধৃত, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৭ উদ্ধৃত, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৮ ঐ, পৃ. ৫৯

১৯ উদ্ধৃত, কাজী আবুল হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২২

২০ ঐ, পৃ. ২১

২১ উদ্ধৃত, শামসুন নাহার মাহ্মুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

২২ উদ্ধৃত, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

২৩ ঐ, পৃ. ২০

২৪ ঐ, পৃ. ২০

২৫ ঐ, পৃ. ৬৪